দিগনগরের দিগন্তে

সৈকত মুখোপাধ্যায়

বাবাকে আজ যেন কথায় পেয়েছিল।

বাড়ি থেকে হাওড়া স্টেশন হয়ে বর্ধমান; সেখান থেকে আবার লোকাল ট্রেন ধরে মানকর— পুরো পথটাই বাবা তার শৈশবে ছেড়ে আসা গ্রামের কথা বলে যাচ্ছিলেন। সেই কতকথার মধ্যে প্রায় ছেদ টানছিল রেলগাড়ির ব্রিজ পেরোনোর ঝমঝম শব্দ, ফেরিওলার চিৎকার কিম্বা অন্ধ ভিখিরির গান। কিম্বা ছেদ নয়; ওই শব্দগুলোও হয়তো বাবার স্মৃতিচারণারই অংশ। অবিকল এইসব শব্দ ধরে ধরেই তো তিনি পঁয়ষট্টি বছর আগে দিগনগর গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। সেদিনও তো এইভাবেই ধানক্ষেতের লালফড়িং ট্রেনে এক জানলা দিয়ে ঢুকে আরেক জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

দিগনগরের মেয়েগুলি নাইতে নেমেছে
চিকন চিকন চুলগুলি সব ঝাড়তে লেগেছে...
তারপর কী যেন?
হাতে তাদের দেবশাঁখা, মেঘ করেছে
গলায় তাদের তক্তিমালা, রক্ত ছুটেছে।

ছোটবেলায় বাবার গলায় এই আবৃত্তি শুনতাম। এখন আমার দেড় বছরে ছেলে টুবলু ঘুমোতে না চাইলে আমিও তাকে এই ছড়া শোনাই। এইবাবে বর্ধমানের এক অজ-গ্রাম দিগননগর কলকাতার কানাগলির নীচে শেকড় ছড়ায়। সে গ্রামের নাম দিগনগর।

কিন্তু আছেটা কী সেই গ্রামে? কেন আমরা আজ সেখানে যাচ্ছি?

সেখানে আছে হিজলপথ, শালুকদিঘী। আছে জিরেনকাটের খেজুররস, কুসুম বীজের রং ধরানো মুড়ি। ধানের মরাই আছে, মাছ খলবলানো খালুই আছে। আর সবার ওপরে আছে এক স্থানীয় দেবতা। নাম— ক্ষেত্রপাল।

সেই ক্ষেত্রপালের মন্দিরেই আজ টুবলুর মানতের চুল দিতে চলেছি। একইভাবে সেখানে আমার প্রথম কর্তিত কেশ দিয়ে এসেছিলেন আমার পিতামহ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এইভাবেই এক নির্জন দেবতার সঙ্গে দিগনগরের মানুষজনের সম্পর্ক বহমান।

মানকর থেকে বাসে উঠে বাবা বললেন, ব্যাস্। আর পনেরো - মিনিট। তারপরেই মন্দির। মন্দির বলতে যেন আবার দক্ষিণেশ্বর - কালিঘাট ভাবিস না। এ এক ছোট্ট চারচালা। সর্ষেখেতের বাসন্তী ঢেউয়ের মধ্যে ভাসমান এক ছোট্ট ডিঙি নৌকো যেন। তার নীচে স্রেফ ধানখেতের মাটি দিয়ে তৈরি একটা বেদি। উনিই ক্ষেত্রপাল।

আমি মনশ্চক্ষে দেখলাম রাঢ় বঙ্গের আদিগন্ত শস্যভূমিকে বুকে জড়িয়ে রেখেছেন এক শ্যামল পুরুষ। তিনি হাতের ইশারায় ডেকে আনছেন মৌসুমি মেঘ। ধানের বুকে ভরে দিচ্ছেন দুধ। আত্মহত্যাকামী কৃষকের চোখে স্বপ্ন ফেরাবার জন্যে তার ঘরের চালে বসিয়ে দিচ্ছেন লক্ষ্মীপ্যাঁচা। চীনে, ভিয়েতনামে, ইরাকে, ইউক্রেনে— চাষিদের গ্রামের প্রান্তে প্রান্তে— এমন কত না ক্ষেত্রপালের মন্দির...— ভাবতে ভাবতেই কনডাক্টর হাঁক দিল— 'দিগনগর'।

****

কোথায় দিগনগর! যেখানে আমরা নামলাম, সেখান থেকে যতদূর চোখ যায়, এঁকেবেঁকে চলে গেছে নির্মীয়মান ইস্পাতকারখানার পাঁচিল। সেই পাঁচিলের মুঠোয় বন্দি সমস্ত হিজলপথ, শালুকপুকুর, ধানের মরাই; কত কুসুমপুর, নয়ানডাঙ্গা, দিগনগর। তারআড়ালে কোথায় ক্ষেত্রপাল? অসুস্থ বাবাকে নিয়ে সেই বোবা পাঁচিলের পরিসীমা ধরে হাঁটতে লাগলাম, যদি কোথাও একটু ঢোকার জায়গা পাই। কিন্তু বৃথাই।

সূর্য ক্রমশ লাল হয়ে উঠল। এখন যদি বাসে না উঠি, ফেরার ট্রেন পাব না। বাবা ক্লান্ত শরীরে একাট ভাঙা পাইপ -এর ওপর বসে পড়েছিলেন। অস্বাভাবিক রকম ঝুঁকে পড়েছিল তার কাঁধ, মাথা। ডাকলাম, 'বাবা'।

তিনি মুখ তুললেন। বিহ্বলভাবে প্রশ্ন করলেন, টুবলুর চুলগুলো নিয়ে কোথায় যাব রে আমরা? ক্ষেত্রপালের মন্দির কোথায় পাব?

তার এই প্রশ্ন উত্তর খুঁজতেই যেন দিগনগরের দিগন্ত ছেড়ে সূর্য অপর গোলার্ধে রওনা দিল।

বানানো গল্প

মুকুল নিয়োগী

আমি সনাতনবাবু আর শাশ্বত একই মেসে থাকতাম। সে কতদিন আগেকার কথা। সপ্তাহান্তে বাড়ি যাওয়া, সপ্তাহের শুরুতে ফিরে আসা সেই মেসে। তারপর একদিন কে কোথায় ছিটকে গেলাম সময়ের টানে।

শুনেছিলাম সনাতনবাবুর স্ত্রী নিজের বান্ধ্যাত্বের অপরাধে নিজেকে অপরাধী মনে করে স্বামীকে আবার বিয়ে করবার জন্য উৎসাহ দিতে দিতে ক্ষান্ত হয়ে একদিন আত্মহত্যা করেন।

শাশ্বত বাংলাদেশে নিজেদের জমি - জমা উদ্ধার করতে গিয়ে ওখানেই এক মুসলমান মেয়ের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে ওখানেই ঘর সংসার করছে।

আর আমি টেরিটিবাজারে এক আধা স্টেশনারি দোকানের বিক্রিবাট্টার তদারকি করি।

****

আসলে এই ঘটনাগুলোর কোনটাই সত্যি নয়। আমি সাউথ ইস্টার্ন রেলের আদ্রা ডিভিশনের একজন অফিসার। কোন এক সময়ে গল্প লিখবার ব্যর্থ চেষ্টা এই ফলশ্রুতি। এগুলো সবই বানানো গল্প